জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং— ২২, ৫ম বর্ষ, ৩০শে সেপ্টেম্বর '৯৫, শনিবার

THE JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbattya Chattagram Janasamhati Samiti

Issue No. 22, 5th year, 30th September '95, Saturday.

শান্তি বাহিনীর হাইড আউটে অতর্কিত হামলা

সম্পাদকীয়

জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গত তিন বছর ধরে যুদ্ধবিরতি বলবৎ থাকাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে আপাততঃ স্বাভাবিক বলে মনে হয়। বাংলাদেশ সরকারও এ সুযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে বরাবরই দেশে-বিদেশে তা প্রচার করে আসছে। আর এই প্রেক্ষাপটে সরকার ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রিত জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরৎ আনতেও উদ্যোগী হয়েছে। এ ছাড়া বিদেশের হাই কমিশন ও দূতাবাস কর্মকর্তাদেরকে সরকারী উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘুরিয়ে উন্নয়নের জোয়ার, জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও স্বাভাবিক পরিস্থিতির সাফাই গেয়ে চলেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক? আর বাংলাদেশ সরকারও কি যুদ্ধবিরতির শর্তাদি মেনে চলছে?

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার পক্ষ যুদ্ধবিরতির শর্তাদি লংঘনের জন্য জনসংহতি সমিতিকে লিখিতভাবে দায়ী করেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন এতদিন বাংলাদেশ সরকার যা যা অভিযোগ করেছে সবই সত্য। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে এযাবৎ যুদ্ধাবস্থাই বিরাজ করছিল। বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্য নিহত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এরা কিভাবে নিহত হলো সেটাই বড় প্রশ্ন। যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী লংঘন করে শান্তিবাহিনীর হাইড্‌ আউট আক্রমণ করতে গিয়ে এরা যে নিহত হয়েছে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পরিহাসের বিষয় যে, গভীর জঙ্গলে শান্তিবাহিনীর গোপন ঘাঁটি ও হাইড্‌ আউটে অভিযান চালানোতে যুদ্ধবিরতি লংঘিত হয় না, প্রতিরোধাত্মক আক্রমণে কেহ নিহত হলে শান্তিবাহিনী অস্ত্রবিরতি লংঘনে অভিযুক্ত হয়। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ লুঠপাট, মারধোর, গ্রেপ্তার, নিরীহ জুম্ম জনগণের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন ইত্যাদি অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা যুদ্ধবিরতির শর্ত লংঘিত হয় না। মূলতঃ সরকারের সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক যুদ্ধবিরতি লংঘনের ঘটনাবলী ধামাচাপা দেয়ার হীন উদ্দেশ্যেই জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে তা অনায়াসেই বলা যেতে পারে। কারণ শান্তিবাহিনী এযাবৎ যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করে আসছে। বস্তুত সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার নীল-নক্সা বাস্তবায়ন করে চলেছে।

যুদ্ধবিরতি লংঘনের অভিযোগ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

● শ্রী অভিজিৎ

দীর্ঘ দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জুম্ম জনগণ জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে নিয়োজিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত যত সরকারই ক্ষমতায় এসেছে তাদের প্রত্যেকের সময়কালে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর বিরতিহীন নিপীড়ন ও নির্যাতন চলেছে। অন্যদিকে জুম্ম জনগণও মরিয়া হয়ে লড়াই করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনী ও বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা এই জাতিগত নিপীড়ন ও নির্যাতন এখনও চলছে না তা নয়, বরঞ্চ তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করছে। '৯০ সালে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে ৯ বছরের স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পর সারা দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস পায়। অতপর বর্তমান বি এন পি সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলে সারা দেশের মত পার্বত্য এলাকার জনগণও কিছুটা শান্তির আলো দেখতে পায় দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতিও ১০ই আগষ্ট, ১৯৯২ থেকে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে থাকে। ফলে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পরিবেশ গড়ে উঠে। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও উল্লেখ করতে হয় যে, বর্তমান সরকারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাঙ্গামাটিতে এক সুধী সমাবেশে বলেছিলেন—কার সাথে যুদ্ধ? কার সাথে যুদ্ধ বিরতি? কিন্তু তারপরও অদ্যাবধি বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতি—এই উভয়পক্ষে যুদ্ধবিরতি চলছে। যুদ্ধবিরতি বলতে উভয় পক্ষের সশস্ত্র চলাফেরা, ঘেরাও, টহল, জিজ্ঞাসাবাদ, অনুসন্ধান, আটক, অত্যাচার ও সকল প্রকারের সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধ রাখা বুঝায়। তার এই শর্তাধীনেই অদ্যাবধি উভয়পক্ষে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ ক্রমাগতভাবে বাড়ানো হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, বিগত তিন বছর ধরে জনসংহতি সমিতি দেশের সামগ্রিক স্বার্থে ও চলমান শান্তি প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে দফায় দফায় যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়িয়ে চলেছে আর একই সাথে সমিতি যুদ্ধবিরতির শর্তাদি যথাযথভাবে মেনে চললেও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তেমন কোন তোয়াক্কাই না করে যুদ্ধবিরতির সুযোগে তারা বিরতিহীন যুদ্ধে তৎপর রয়েছে। অথচ সরকারী পক্ষ সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে যুদ্ধবিরতি লংঘনের জন্য শান্তিবাহিনীকে দায়ী করছে। অতি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশেষ কার্যাদি বিভাগ থেকে লিখিতভাবে যুদ্ধবিরতি লংঘনের জন্য সমিতিকে দোষারোপ করা হয়েছে। উক্ত পত্রে যুদ্ধবিরতি লংঘনের যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিযোগসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ :

১। ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ ইং শান্তি বাহিনী কর্তৃক মারিশ্যা এলাকায় উপজাতীয়দের ব্যাপক ধরপাকড় করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক প্রত্যন্ত গভীর জঙ্গলে বর্তমানে ১৮ জন উপজাতিকে গলায় লোহার বেড়ী দিয়ে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছে।

২। ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ বিকাল বেলায় মোঃ জাকির আহম্মদ, পীং কবির আহমদ, সাং-মাদ্রাসা পাড়া বাঘাইছড়ি ও মোঃ সেলিম, পীং-শেখ আহমদ, সাং- ঐ বাঘাইহাট থেকে পায়ে হেটে বাঘাইছড়ি আসার পথে দাংগাছড়া নামক স্থানে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা তাদের থেকে নগদ ৫৫০ টাকা ও ২৪ কেজি সিলভার দ্রব্য জোরপূর্বক ছিনতাই করে নেয়।

৩। অস্ত্র বিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে মার্চ '৯৫

পর্যন্ত অস্ত্র বিরতি লংঘন	৪২০ বার
চাঁদা আদায়ের ঘটনা—	২৫০ ”
নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ—	৭১ ”

অনুষ্ঠিত সভা—	৩৯	”
অপহরণ—উপজাতি—	৭৩	জন
অউপজাতি—	৬৯	”
হত্যাকাণ্ড-বেসামরিক উপজাতি—	১৪২	”
অউপজাতি—	৮	”
নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য হত্যা—	৩২	”
” ” ” আহত—	৬	”

৪। ৫-৩-৯৫ রাঙ্গামাটি নানিয়াচর এলাকা থেকে গুচ্ছ-গ্রাম সমিতির মাছ ধরার জাল এবং নৌকাসহ মাঝিকে অপহরণ।

৫। ৫-৩-৯৫ ও ৯-৩-৯৫ ঘাগড়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর টহল দলের উপর শান্তি বাহিনীর গোলাবর্ষণ।

৬। ১৬-৩-৯৫/১৭-৩-৯৫ চাঁদা না দেয়ায় পানছড়ি থেকে ৭ জন চাকমা উপজাতিকে অপহরণ।

৭। ২০-৩-৯৫ কাপ্তাই এলাকার বিলাইছড়িতে নিরপত্তা বাহিনীর টহল দল সন্ত্রাসীদের দেখতে পেয়ে ধাওয়া করে। এতে ৪টি দেশীয় গাদা বন্দুক, গোলাবারুদ, ৬টি গ্রেনেড, ২০০০ ভারতীয় রূপী ও ৭৪৬ বাংলাদেশী টাকা উদ্ধার করা হয়।

৮। ১৩-৪-৯৫ বাঘাইছড়ি থানাধীন ওল্ড লংকর বি. ও. পি'র উপর শান্তি বাহিনী আক্রমণ করে। গোলাগুলি বিনিময় কালে শান্তি বাহিনী এক পর্যায়ে ২" মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে।

৯। ১, ১০, ১১ মে '৯৫ শান্তি বাহিনী কর্তৃক অপহৃত:

মুইচা প্রু মারমা—	রাঙ্গামাটি
অং পচু ”	”
বাল স্বালা ”	”
ক্লাউ ক্লাউ ”	”
থাইছি ”	”
অংথুই প্রু ”	”
বেশীও ”	”
প্রেম চাকমা	”
নেপাল তঞ্চঙ্গ্যা	রাঙ্গামাটি
মন থু প্রু মারমা	”
বাশী মোহন ”	”
লাথোয়াই ”	”

উপরোক্ত অভিযোগগুলির মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯ নম্বর সমূহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও সাজানো। যুদ্ধ বিরতিকালীন শান্তি বাহিনী কর্তৃক অপহরণের ঘটনা সংঘটিত হবার কোন প্রশ্নই থাকতে পারেনা। ৫ নং অভিযোগে নিরাপত্তা বাহিনীর টহল দলের উপর শান্তি বাহিনীর গোলাবর্ষণের যে কথা বলা হয়েছে তাও সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে উক্ত ঘটনার দিন রাঙ্গামাটি জেলার ঘাগড়া জোনের দুই দল সেনা এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। উক্ত অভিযানে দুই সেনাদল গভীর জঙ্গলে পরস্পরকে শান্তি বাহিনী মনে করে গুলি বিনিময় করে। এই ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে আর্মিরা শান্তি বাহিনীকে দায়ী করেছে।

সরকারের দেয়া অভিযোগ পত্রের ৮ নং অভিযোগটিতে কিছুটা সত্যতা রয়েছে। তবে ঘটনাটি ঘটবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যৌক্তিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে। তা হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থানরত সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্পের কাছাকাছি বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্টপোষকতায় ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে কয়েকটি বিদেশী সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে সাজেক অঞ্চলে ও বান্দরবন জেলায় অবস্থান নিয়ে আছে। এই বিদেশী সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্যদের হাতে সরকার অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেয়। সরকারের মূল উদ্দেশ্য—তাদের দিয়ে শান্তি বাহিনীর হাইড আউট আক্রমণ পরিচালনা করা অর্থাৎ তাদের প্রশিক্ষণ, আশ্রয় ও অস্ত্র সাহায্য দিয়ে শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে কাজে লাগানো। এভাবে উক্ত অভিযোগে বাঘাইছড়ি থানার অন্তর্গত ওল্ড লংকর বি, ডি, আর ক্যাম্পের পাশে আশ্রিত একটি বিদেশী সশস্ত্র গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে আসছিল। উপায়ান্তর না দেখে শান্তি বাহিনী

১৩ই এপ্রিল '৯৫ উক্ত সশস্ত্র দলের আস্তানায় গুলি বর্ষণ করে যাতে তারা পালিয়ে যায়। উক্ত ঘটনায় গুলি বর্ষণের সময় শান্তি বাহিনীর সদস্যরা মোটেই বি ও পি'র (বি ডি আর ক্যাম্প) উপর হামলা করেনি। তাই এখানে যুদ্ধবিরতি লংঘনের কোন প্রশ্নই আসে না। সরকারী বাহিনী যাতে এই বিদেশী দুষ্কৃতকারীদের শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য জনসংহতি সমিতি অবশ্যই আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণের সতর্ক থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে যুদ্ধবিরতি লংঘনের অভিযোগ এই প্রথম নয়। সরকারী পক্ষ বিগত সংলাপগুলোতেও বারবার এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। বিশেষ করে ২য় ও ৪র্থ সংলাপে সরকারী পক্ষ এই যুদ্ধ বিরতি লংঘনকে অন্যতম আলোচ্য সূচীতে পরিণত করার চেষ্টা করে। আলোচনার নামে মূল বিষয়কে পাশ কাটিয়ে একতরফা অভিযোগ উত্থাপন করে সরকার সংলাপকে দীর্ঘায়িত ও কালক্ষেপণের কৌশল হিসাবে এসব অভিযোগ ব্যবহার করছে বলে প্রতীয়মান হয়।

সরকারী অভিযোগ পত্রে ৪২০ বার অস্ত্রবিরতি লংঘনের জন্য জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করা হলেও সেসব কি ধরনের অস্ত্রবিরতি লংঘন তা খুব একটা স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষের ঘটনা দেখানো হয়েছে ৭১ (একাত্তর) বার এসব হামলায় বা সংঘর্ষে ৩২ (বত্রিশ) জন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য নিহত হওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠে উক্ত সংঘর্ষগুলো কোথায় সংঘটিত হয়েছে? বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্পে শান্তি বাহিনী হামলা চালিয়েছে না অন্যত্র গভীর জঙ্গলের এসব সংঘর্ষ হয়েছে? বস্তুতঃ সদর এলাকায় কিংবা লোকালয়ে সংঘর্ষ হয়েছে বলে এমন কোন নজির সশস্ত্র বাহিনী দেখাতে পারবে না। সেনা বাহিনীর নিয়মিত টহল দলের উপর শান্তি বাহিনী আক্রমণ করেছে এমন ঘটনাও তাদের কাছে নেই। উল্লেখিত প্রত্যেকটি ঘটনা হয়েছে পাহাড়ের গভীর অরণ্যে। যুদ্ধ বিরতির শর্তাদি অমান্য করে সরকারী বাহিনীর সদস্যরা শান্তি বাহিনীর ঘাঁটি এলাকা, হাইড আউট ইত্যাদি আক্রমণ করতে সব সময়ই কম্বিং অপারেশন অব্যাহত রেখেছে। শান্তি বাহিনীর দেয়া যুদ্ধবিরতির সুযোগে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বরাবরই আক্রমণাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পক্ষান্তরে শান্তি বাহিনীরও যুদ্ধ বিরতি কালীন আত্মরক্ষার অবকাশ বা অধিকার রয়েছে। ফলে যতবারই সরকারী বাহিনীর সদস্যরা গভীর অরণ্যে শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়েছে ততবারই তারা যুদ্ধবিরতি লংঘন করেছে। এতে শান্তিবাহিনী আত্মরক্ষামূলক সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য। আর এ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষে হতাহত হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে। শান্তি বাহিনী আত্মরক্ষার্থে যদি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয় তবে তা কখনই যুদ্ধবিরতি লংঘনের পর্যায়ভুক্ত নয়। অপরদিকে এ যাবৎ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা যুদ্ধবিরতির শর্ত বরখেলাপের অন্তর্ভুক্ত। সংলাপের সময় সরকারী কমিটি যুদ্ধবিরতি পালনের প্রতিশ্রুতি বারংবার ব্যক্ত করলেও সেনা বাহিনী তা কোন সময়েই গুরুত্ব প্রদান করেনি। আর তাই ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ইং বাঘাইছড়ি থানার কজোইছড়ি ক্যাম্পের সেনা অধিনায়ক লেঃ ফেরদৌস বাঘাইছড়ি থানার অন্তর্গত মোরঘোনা ছড়ায় এক জনসভায় বলেন যে, "আমরা তো যুদ্ধবিরতি দিইনি। দিয়েছে রাশেদ খান মেনন।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গত ২০শে জুন '৯৫ইং বাঘাইছড়ি থানার করেঙ্গাতলী বনাঞ্চলে সেনাবাহিনী শান্তি বাহিনীর হাইড আউট আক্রমণ করতে গেলে সংঘর্ষ বাধে। শান্তি বাহিনীর এই প্রতিরোধাত্মক আক্রমণে দু'জন সেনা সদস্য নিহত ও একজন অফিসার আহত হয়েছে। ২১শে জুন এরূপ অপর আরেক সংঘর্ষে নানিয়াচরের প্রত্যন্তাঞ্চলে তিন সেনা সদস্য নিহত ও চারজন আহত হয়। কিন্তু অত্যন্ত

পরিতাপের বিষয় যে, এসব হামলার জন্য সরকার পক্ষ উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ের মত জনসংহতি সমিতিকেই যুদ্ধবিরতি লংঘনে অভিযুক্ত করেছে। প্রসঙ্গতঃ বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিগত ১৪ই জুন রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী থানার কৃষি ব্যাঙ্কটি লুঠ হয়। রহস্যজনকভাবে এই ব্যাংক ডাকাতির জন্য সরকারী প্রচার মাধ্যমে শান্তি বাহিনীকে দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটি সম্পূর্ণ অন্য রকম। উক্ত থানার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন ধরে একটি বিদেশী দুস্কৃতিকারী সশস্ত্র দল স্থানীয় প্রশাসন ও বান্দরবানের সেনা বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে আশ্রয় নিয়ে অবস্থান করছিল। এই সশস্ত্র দলটিই রাজস্থলী সেনা কর্তৃপক্ষ ও বান্দরবানে কর্মরত এন এস আই (ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স) এর পদস্থ কর্মকর্তার যোগসাজসে উপরোক্ত ব্যাংক ডাকাতি সংঘটিত করে। জনসংহতি সমিতির ভাবমূর্তি স্থানীয় জনগণের নিকট ক্ষুণ্ণ করতে ও যুদ্ধবিরতি লংঘনের অভিযোগ সাজাতে পরিকল্পিতভাবে এই ব্যাংক লুঠের ঘটনা ঘটানো হয় অথচ পুরো বিষয়টা সম্পর্কে বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চয়ই বিশেষভাবে অবগত।

সরকার আরও ২৫০ বার চাঁদা তোলার ঘটনাকে যুদ্ধবিরতি লংঘন বলে অভিযোগ করেছে। এটা সকলের অবিদিত নয় যে, জনসংহতি সমিতি জনসাধারণ, ব্যবসায়ী, সরকারী ঠিকাদার, বন বিভাগের কাঠ সংগ্রহ, কর্ণফুলী পেপার মিলের বাঁশ সংগ্রহের উপর নামমাত্র চাঁদা আদায় করে আন্দোলনের ব্যয়ভার বহন করে চলেছে। এটি একটি বেসামরিক কার্যক্রম এবং যুদ্ধ বিরতির কোন শর্তের আওতায় ইহা পড়ে না। বলা বাহুল্য, সরকারী কমিটির প্রধান ও যোগাযোগ মন্ত্রী অলি আহমেদ উভয়-পক্ষে আনুষ্ঠানিক সংলাপ চলাকালে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ বিষয়টি স্বীকার করে কম মাত্রায় চাঁদা তোলার কথা বলে থাকেন। তাই শান্তি বাহিনী কর্তৃক চাঁদা আদায়ে কারো শান্তি অথবা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কথা নয়। বরঞ্চ শান্তিপূর্ণভাবে চাঁদা আদায়ের প্রক্রিয়ায় সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক বাধা প্রদানকরনই যুদ্ধবিরতি লংঘন বলে গণ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, সরকারী বাহিনী শান্তি বাহিনীর চাঁদা সংগ্রহকারীদের প্রধান টার্গেট করেই এ যাবৎ বিভিন্ন লোকালয়ে সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে আসছে।

সরকার পক্ষ থেকে শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি লংঘনের অভিযোগের তালিকায় ৭৩ জন উপজাতি ও ৬৯ জন অউপজাতি অপহরণের সংখ্যা বানোয়াটভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। হত্যার তালিকায়ও ১৪২ জন উপজাতি ও ৮জন অউপজাতির একটি সাজানো পরিসংখ্যাণ দিয়েছে। কিন্তু এসব অভিযোগে বর্ণিত অপহরণ ও হত্যার তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। যুদ্ধবিরতি কালীন কোন বাঙ্গালী নিহত হয়ে থাকলেও তা নেহায়েত নিজেদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে অথবা সশস্ত্র বাহিনীর ষড়-যন্ত্রে উক্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকবে। যেমন—৮ই জানুয়ারী, ১৯৯৪ইং খাগড়াছড়ি সদরে বিবাদমান রিক্সা-চালক সমিতির কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী রিক্সাচালক জনৈক জামাল উদ্দীনকে নির্মমভাবে আক্রমণ করে মৃত প্রায় অবস্থায় জুম্ম অধ্যুষিত মহাজন পাড়ায় ফেলে রেখে যায়। স্থানীয় জুম্মরা মৃতপ্রায় জামাল উদ্দীনের কাতর গোঙানী শুনতে পেয়ে তাকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালেই জামাল উদ্দীনের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুকে জুম্মদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এই মর্মে সাজিয়ে সেনা বাহিনীর মদতপুষ্ট পার্বত্য গণপরিষদের নেতৃত্বে অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মুসলমানেরা একটি মিছিলের আয়োজন করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা চালায়। স্থানীয় জুম্ম ছাত্র ও যুব নেতার বিরুদ্ধে সাজানো অভিযোগে তারা মামলাও দায়ের করে। এভাবে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার জন্য মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে জুম্ম জনগণকে অথবা শান্তি বাহিনীকে কত দায়ী করা হচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

পক্ষান্তরে ১৯৯২ সালের ১০ই আগষ্ট হতে জনসংহতি সমিতি দেশের নির্বাচিত সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির সদিচ্ছা হিসেবে একতরফা যুদ্ধবিরতি

ঘোষণা করার পর উভয়পক্ষে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতি চলাকালীন ৬/১১/৯২ইং সেনা বাহিনীর এক অতর্কিত আক্রমণে সমিতির এক সদস্য নিহত হন ও অপর একজন গ্রেপ্তার হন। রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার দুর-ছড়ি, কজোইছড়ি ও চিত্তারাম ছড়া ক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেন নাদির (৪৬ ই, বি, আর) এর নেতৃত্বে দোজরী বাজার ও পিঠাগুলাছড়ায় এক সামরিক অভিযান চালানোর সময় এই ঘটনা ঘটে। এরপর ৯/১১/৯২ ইং খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি থানাতে উল্টাছড়ি ক্যাম্পের মেজর মিজান (২৩ ই, বি, আর) এর নেতৃত্বে গোলোক্যা পাড়াতে এক ঝটিকা অভিযানে লোকালয়ে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ ও গ্রামবাসীর উপর নির্যাতন চালানো হয়। ১৯/১২/৯২ইং লক্ষীছড়ি ও মানিকছড়ি জোনের দু'দল সেনা বাহিনী ছোট ধুরুং, পেকুয়া, কলাবন্যা, বর্মাছড়ি ইত্যাদি এলাকায় শান্তি বাহিনীর হাইড আউট আক্রমণ করে। এভাবে ৬ই নভেম্বর '৯২ থেকে ২৫শে জুন '৯৫ইং পর্যন্ত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক তৎপরতা ও সন্ত্রাসের ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৩৬ বার যুদ্ধবিরতি লংঘিত হয়েছে। তা নিম্নরূপ ঃ

জনসংহতি সমিতির সদস্য নিহত—	৪ জন
" " " আহত—	১৪ "
" " " গ্রেপ্তার—	১৭ "
সাধারণ জুম্ম নিহত—	৩৫ "
" " আহত—	৩২৯ "
" " গ্রেপ্তার—	২৮১ "
সশস্ত্র সামরিক অভিযান—	১৮৫ বার
শারীরিক নির্যাতনের শিকার—	৩০২ জন
ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা—	২৩৪টি
লুটপাটের ঘটনা—	৫৯ "
নারী ধর্ষণ—	২০ জন
ধর্ষণের অপচেষ্টা—	১৯ বার
বাড়ী তল্লাসী—	২৯৭টি
শান্তি বাহিনী হাইড আউট আক্রমণ—	২৯ বার
জুম্ম গ্রামবাসীর উপর অত্যাচারের ঘটনা—	৭৩টি
নুতন সামরিক ক্যাম্প স্থাপন—	৩৫টি

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে ১৯৯৩ সালের ১৭ই নভেম্বর রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচরে এক লোমহর্ষক গণহত্যা চালানো হয়। এই হত্যাকাণ্ডে ২৯ জন জুম্ম নরনারী ঘটনা-স্থলেই নির্মমভাবে নিহত হয়। আহত হয় ১৬২ জন এবং নিখোঁজ হয় আরো অনেকেই।

চলমান সংলাপ ও যুদ্ধবিরতির সুবাদে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তাদের সামরিক কার্যক্রম অধিক মাত্রায় জোরদার করে চলেছে। তারা সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ক্যাম্প স্থাপন, সম্প্রসারণ, স্থানান্তর, শান্তি বাহিনীর গোপন যোগাযোগ পথে এ্যাম্বুশ, গভীর জঙ্গলে টহল অভিযান, চাঁদা সংগ্রহকারীদের উপর আক্রমণ, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, সাধারণ জুম্ম জনগণের উপর অত্যাচার, নারীধর্ষণ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ এর নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলা ইত্যাদি অহরহ ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। তন্মধ্যে যুদ্ধবিরতি কালীন বাংলা-দেশ সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে কিছু সংখ্যক ঘটনা উল্লেখ করা গেল—

১৬/৩/৯৩ উল্টাছড়ি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন উমর ফারুকের নেতৃত্বে ২৩ ই বি আর-এর একটি সেনাদল মহালছড়ি থানার অন্তর্গত কলাবন্যা ও সাতঘর পাড়ায় অভিযান চালিয়ে শান্তিবাহিনীর তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে।

১৬/৪/৯৩ মহালছড়ি জোনের সেনাদল মহালছড়ি থানার অন্তর্গত তুয়াটেক কেরেঙানালা নামক স্থান থেকে অপর একজন শান্তিবাহিনী সদস্যকে ধরে নিয়ে যায়।

১২/৮/৯৩ গুইমারা জোনের সিন্দুকছড়ি ক্যাম্প ও মহালছড়ি জোনের ধমনীবাট ক্যাম্প হতে মেজর আমীনের নেতৃত্বে ৪নং ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের দুই সেনাদল বড় পিলাক পাহাড়ী এলাকায় অত্যাচার চালানোর সময় প্রেম-কুমার চাকমাকে গ্রেপ্তার ও পরে অত্যাচার চালিয়ে তার কান অকেজো করে দেয়।

২৬/৮/৯৩ রামগড় এলাকার গুইমারাতে গরু চরানোর সময় জালিয়া পাড়া পুলিশ ক্যাম্প হতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা শ্রীমতি গিয়াং আসা মারমাকে ধর্ষণ করে। উপরোক্ত দু'টি ঘটনা জানুয়ারী '৯৫ ইং এ জাতিসংঘের ইকনমিক ও সোসিয়াল কাউন্সিলের কমিশন অন হিউম্যান রাইটস্ এর পঞ্চদশ অধিবেশনে উত্থাপিত হয়েছে।

২২/১২/৯৩ লক্ষীছড়ি জোনের সেনাসদস্যরা শান্তি বাহিনীর এক সদস্যকে গ্রেপ্তার ও একই সময়ে এক জুম্ম নারীকে ধর্ষণ করে।

৪/৫/৯২ লক্ষীছড়ি থানার ধুল্যাতলী ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন জাহেদের নেতৃত্বে ২৬ ই বি আর-এর একটি সেনাদল লক্ষীছড়ি থানার অন্তর্গত বামে বানরকাটা এলাকার গভীর অরণ্যে শান্তিবাহিনীর উপর আক্রমণ করে। উভয় পক্ষের সংঘর্ষের পর সেনাদলটি ক্যাম্পে ফেরার পথে অযোধ্যা মুনি চাকমা, বরুন্যা চাকমা, কালাচান চাকমা, জ্যোতির্ময় চাকমা, চণ্ডি কুমার চাকমাসহ আরো অনেক নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়ীঘর লুঠপাট করে।

২৭/১/৯৪ বড়কল থানার ভূষণছড়া ইউনিয়নের হেঙত্যা কার্বারী পাড়ার পোড়াবাড়ী নামক স্থানে একটি সাব-জোন ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

১২।২।৯৫ বিনা নোটিশে খাগড়াছড়িতে পুলিশ বাহিনী কর্তৃক পাহাড়ী ছাত্র ও যুব নেতা প্রদীপ্ত খীসা, শক্তিপদ রোয়াজা, শুভাশীষ চাকমা, চাথোই মারমা, প্রকাশ চাকমা ও প্রীতি রঞ্জন ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করে।

২৫/৩/৯৪ ইং রবিবার ১৮নং ই বি আর খাগড়া চম্পাতলী জোনের নাভাঙ্গা আর্মি ক্যাম্পের সুবেদার খালেদ হাসানের নেতৃত্বে কাউখালী থানার তুলুছড়িতে এক সামরিক অভিযান চালানোর সময় শ্রীমতি নিঙ্গিরা পুদি চাকমাকে ধর্ষণ ও অন্য চার গ্রামবাসীকে অত্যাচার করা হয়।

৫/৪/৯৪ পানছড়ি থানার ভাইবোনছড়া আর্মি ক্যাম্পের সেনারা এলাকার ত্রিপুরা গ্রামবাসীদের বিনা-বেতনে ক্যাম্পের কাজ করতে বাধ্য করে। যারা কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করে তাদের মধ্যে ৩০ জনকে বেদম প্রহার করা হয়।

১৭।৮।৯৪ বাঘাইছড়ি থানার নাক্সাতলী ক্যাম্পের কম্যাণ্ডার লেঃ পাশা ও তার সেপাই আব্বাস উদ্দীন গুলি করে নিরাপরাধ জ্ঞান আলো চাকমা (৩০) পীং পদারাম চাকমা, গ্রাম—দক্ষিণ বঙ্গলতলী-কে হত্যা করে।

২৮।৮।৯৪ লক্ষীছড়ি থানার মরাচেঙে এলাকায় বর্মাছড়ি ও শুকনাছড়ি আর্মি ক্যাম্পের সেনারা জনসংহতি সমিতির দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করে।

২২।১২।৯৪ লক্ষীছড়ি থানার ধল্যাতলী ক্যাম্প কম্যাণ্ডার আশে পাশের জুম্ম গ্রামবাসীদের নিয়ে জোর-পূর্বক জনসভা ডাকে ও সভায় যুদ্ধবিরতি পরিপন্থী বক্তব্য রাখে।

৩১।১।৯৫ বান্দরবান জেলার থানছি থানাতে বড়-মধু বি ডি আর ক্যাম্পের ৩১ ব্যাটালিয়ানের সদস্যরা বড় মধুকছড়া গ্রামে এক সামরিক অভিযান চালায়। উক্ত অভিযানে তারা ওকাই মারমা ও এভামং মারমাকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে।

১৪।২।৯৫ বাঘাইছড়ি থানার মারিশ্যা জোনের সেনারা মধ্যম বাঘাইছড়িতে এক তল্লাসী অভিযান চালায় এবং ঐ গ্রামের ললিত বিকাশ চাকমার বাড়ী ঘেরাও করে তাকে নির্যাতন করে।

১৫।৩।৯৫ বান্দরবান জেলা সদরে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করা হয়। এতে শতাধিক জুম্ম ছাত্র ও সাধারণ জনগণ আহত ও দুই শতাধিক ঘর-বাড়ী ভস্মীভূত ও লুঠপাট হয়।

২৩।৩।৯৫ নানিয়াচর থানার ঘিলাছড়িতে সশস্ত্র বাহিনীর মদতে এক বেআইনী অনুপ্রবেশকারী কর্তৃক কুমারী রুনা চাকমা (১৩) পীং শান্তিরাম চাকমা,

গ্রাম ভানে তৈচাংমা, জোরবুয়া মহাজনপাড়া, নানিয়াচরকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

৪।৪।৯৫ লক্ষীছড়ি থানার বর্‌মাছড়ি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন আমীনের নেতৃত্বে পার্শ্ববর্তী জুম্ম অধ্যুষিত গ্রামে সামরিক অভিযান চালানোর সময় ১২ জন গ্রামবাসীকে অমানুষিকভাবে অত্যাচার চালায়।

১৮-৪-৯৫ ইং ২৩ ই বি আর-এর উল্টাছড়ি গোলক্যা পাড়া ক্যাম্পের মেজর নাসিরের নেতৃত্বে মহালছড়ি থানার কিয়াংঘাট এলাকায় অভিযান চালানোর সময় ১৫ টি বাড়ীতে লুটপাট এবং তল্লাসী চালানো হয়।

২-৫-৯৫ বাঘাইছড়ি থানার করেঙ্গাতলী বাজারের শহিদুল ইসলাম সেনা-বাহিনীর উস্কানীতে মিস্‌ মঙ্গলা রাণী চাকমা, পীং নাগরচান চাকমা-কে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

১২-৬-৯৫ ও ১৫-৬-৯৫ বাঘাইছড়ি থানার অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মুসলিম কর্তৃক নব-বিবাহিতা স্বপ্না চাকমা ও মিস্‌ কল্পনা চাকমা নামে দুই জুম্ম নারী গণ-ধর্ষণের শিকার হয়।

১৮-৭-৯৫ খাগড়াছড়ি পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের মিছিলে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে অনেককে আহত করে।

১৯৯৩ সালের ন্যায় গোটা '৯৪, '৯৫ সালেও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। সামরিক তৎপরতার পাশাপাশি সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা জোরপূর্বক জনসভা করে শান্তি বাহিনী ও যুদ্ধবিরতি বিরোধী অনেক বক্তব্য দেয়া হয়। এতে নিম্নস্তরের সামরিক অফিসার থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম ডিভিশনের জি, ও, সি,-ও সরাসরি উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। ১৯৯৪ সালে এপ্রিল মাসে বাঘাইছড়ি সাজেক এলাকার ওল্ড লংকর ক্যাম্পের আশেপাশের পাংখো ও লুসাই সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে এক জনসভা করা হয়। এতে জি, ও, সি স্বয়ং উপস্থিত থেকে আন্দোলন বিরোধী বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি আশ্বাস দেন যে, যে সমস্ত পাংখো পরিবার মিজোরামে চলে গেছে তারা ফিরে এলে সরকার পুনর্বাসন দেবেন। এরপর অক্টোবর মাসে আবার ঐ এলাকার জি, ও, সি আগমন করেন এবং এক জনসভায় পাংখোদের জন্য একটি আলাদা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব দেন। পাংখো নেতৃবৃন্দকে তিনি এও বলেন যে, তাদের শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গত ১০ই জুলাই '৯৫ ইং বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ আশ্রয়ে থাকা একটি বিদেশী দুস্কৃতিকারী সশস্ত্র দল সাজেক এলাকার আমতলা বাজার আক্রমণ করে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যায়। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা পালিয়ে যাবার সময় শান্তি বাহিনী সদস্যদের উপরও আক্রমণ করে। এতে উপেন্দ্র সেন চাকমা নামে এক জুম্ম লোক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এই সশস্ত্র দুস্কৃতকারী দলটি বাজার লুঠ করে নিকটস্থ নিউ লংকর বিডি আর ক্যাম্পে চলে যায়।

বিগত ২৭ শে জুলাই '৯৫ চট্টগ্রামের জি, ও, সি আবার সাজেক এলাকার পাংখোদের আয়োজিত এক সমাবেশে উপস্থিত হন। তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। জনসভায় পাংখো নেতৃবৃন্দ আমতলা বাজার লুঠপাট ও এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর জন্য এক বিদেশী সশস্ত্র গ্রুপকে দায়ী করে তাদের বিতাড়নের দাবী জানান। কিন্তু রহস্যজনকভাবে জি, ও, সি পাংখোদের উক্ত প্রতিবাদের কোন আমল না দিয়ে আমতলা ঘটনার জন্য শান্তি বাহিনীকে দায়ী করেন এবং শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। জি, ও, সি তার বক্তব্যে প্রয়োজনে পাংখোদের সশস্ত্র ট্রেনিং ও অস্ত্র সাহায্য দিয়ে শান্তি বাহিনী বিরোধী কার্যকলাপ চালানোর কথা বলেন। বলা বাহুল্য—এ সবই যুদ্ধবিরতি লংঘনের পর্যায়ে পড়ে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত উপরোক্ত সমস্ত ঘটনা চলমান যুদ্ধবিরতি শর্ত লংঘনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত না হয়ে পারে না। অতএব, সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত

অভিযোগগুলো পর্যালোচনা ও সশস্ত্র বাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতা খতিয়ে দেখলে ইহা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সরকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত অভিযোগসমূহ ভিত্তিহীন। পক্ষান্তরে সশস্ত্র বাহিনীই এযাবৎ বিরামহীনভাবে যুদ্ধবিরতির শর্তাদি লংঘন করে চলেছে। তাই উপরোল্লিখিত ঘটনাগুলোই দিবালোকের মত এটাই পরিস্কার করে দেয় যে, সরকারী বাহিনীই যুদ্ধবিরতি লংঘনের অহরহ ঘটনার জন্য দায়ী। অন্যদিকে এসব ঘটনাবলী অর্থাৎ সামরিক সন্ত্রাস, নির্যাতন, নিপীড়ন, সামরিক অভিযান, অগ্নিসংযোগ, গ্রেপ্তার, লুঠতরাজ, ধর্ষণ, মারধর ইত্যাদিই প্রমাণ করে যে, যুদ্ধবিরতি কালীনও পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি হয়নি। অথচ এ যাবৎ বাংলাদেশ সরকার নির্লজ্জভাবে দেশে-বিদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ বলে প্রচার করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের কৃতিত্ব জাহির করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তথাকথিত শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির অজুহাতে সরকার জুম্ম শরণার্থীদের দেশে ফেরৎ আনতেও বেশ তৎপর। বিভিন্ন পশ্চিমা দাতা দেশগুলোর দূতাবাস কর্মকর্তাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘুরিয়ে নিয়ে পরিস্থিতির স্বাভাবিকতা ও উন্নয়নের জোয়ার প্রমাণ করতে এযাবৎ ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

কিন্তু সরকারী বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিকে কি আদৌ স্বাভাবিক রেখেছে? এর সোজা উত্তর হল "না"। চলমান শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়াকে কাল-ক্ষেপণের কৌশল হিসেবে সরকার যেমন ব্যবহার করছে তেমনি সামরিক কর্তৃপক্ষও এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত ও বানচাল করার ষড়যন্ত্রে সদা তৎপর। সরকার যুদ্ধ-বিরতির নামে পার্বত্য এলাকার পরিবেশকে স্বাভাবিক দেখানোর পাশাপাশি তার জুম্ম উচ্ছেদ ও ইসলামী সম্প্রসারণবাদের কার্যক্রম যেমন অব্যাহত রেখেছে তেমনি চলমান সংলাপকেও বহি:বিশ্বে প্রচার করে সমস্যা সমাধানে তথাকথিত সদিচ্ছা দেখাচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সরকার পক্ষের প্রকৃত কোন সদিচ্ছাই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সরকার ও তার সশস্ত্র বাহিনীর কার্যকলাপই এটা প্রমাণ করে দেয় যে, এ অঞ্চলে কোন শান্তি বা উন্নয়নের জোয়ার নেই। বরং বলা যায় পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে করার দুরভিসন্ধি নিয়ে সরকার এগুচ্ছে এবং জুম্ম জনগণকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে অথবা ব্যাপকভাবে বাঙালী মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করে চলেছে।

অভিমত

পার্বত্য এলাকায় সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে কিন্তু জুম্ম জনগণ তার সুফল পাচ্ছে না

—সন্তু লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান কোন পথে? শান্তিবাহিনী কি চায়? সরকারের সঙ্গে আলোচনা কতোদূর এগুলো? শান্তিবাহিনীর ভেতরে কি বিরোধ চলছে? সর্বোপরি পার্বত্য এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি; জুম্ম জনগণের সমস্যা, উপজাতীয় প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন ইত্যাদি প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান, শান্তিবাহিনীর নেতা যোতিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা তার মতামত ব্যক্ত করেছেন এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে। সম্প্রতি পানছড়ীর দুদুকছড়িতে শান্তিবাহিনীর গোপন আস্তানায় তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সাংবাদিক সালিম সামাদ। নিচে সাক্ষাৎকারের প্রথম অংশ ছাপা হলো:

সালিম সামাদ: সরকারের সঙ্গে ৭ম সংলাপ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছিলেন, সংলাপ ব্যর্থ হলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার আদায় করা হবে। এই সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলার প্রয়োজন হলো কেন?

সন্তু লারমা: দেখুন, ৭ম সংলাপ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ ধরণের কোনো কথা আমি বলিনি। অবশ্য, উক্ত সংবাদ সম্মেলনের এক পর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ''যদি চলমান ডায়লগ ব্যর্থ হয়, পাঁচদফা মৌলিক অধিকার না দেয় তবে হোয়াট ইজ ইয়োর নেক্সট স্ট্র্যাটেজি''? তখন আমি বলেছিলাম, ''আন্দোলন চলতে থাকবে—বাইশ বছর ধরে তো চলছে।''

সা সা: সংলাপের বর্তমান অবস্থা কি? অনেকের ধারণা সংলাপে যেভাবে অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হচ্ছে না। পার্বত্য সমস্যা সমাধানে বর্তমান সংলাপ কোনো কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে কি আপনি মনে করেন?

সন্তু: সংলাপের বর্তমান অবস্থা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিগত এরশাদ সরকারের আমলে ছয়বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি জনসংহতি সমিতির উপস্থাপিত পাঁচদফা দাবিনামাও এরশাদ সরকার কর্তৃক গ্রহণ করার পর পুনরায় ফেরৎ দেওয়া হয়। এরপর বর্তমান খালেদা জিয়া সরকারের সঙ্গে ইতিমধ্যে আটবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে সমিতির সংশোধিত পাঁচদফা দাবিনামা পেশ করা হয় এবং সরকার পক্ষ থেকে এই পাঁচদফা দাবির উত্তরও লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ উত্তর অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ও অগ্রহণযোগ্য ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ১৯৮৯ সালে এরশাদ সরকার কর্তৃক প্রণীত ও প্রদত্ত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের মাধ্যমে সমিতির পাঁচদফা দাবী পূরণ করা হয়েছে, তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দেওয়া হয়েছে। বিগত ৭ম বৈঠকে সরকার পক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে চারসদস্যবিশিষ্ট একটা উপকমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত উপকমিটির সঙ্গে ৪ জুন, ১৯৯৪ একবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে পাঁচদফা দাবি তথা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে যে সব আলোচনা হয়েছে তাতে সরকার পক্ষের মনোভাব নিম্নোক্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের সাংবিধানিকভাবে জাতিগত স্বীকৃতি প্রদান করা যেতে পারে, এবং

খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদ আইনের মৌলিক দিকগুলো বজায় রেখে ও তিনটি জেলাকে নিয়ে একটা APEX BODY গঠন করে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সংশোধন করতঃ চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হতে পারে।

সুতরাং, সরকার পক্ষের সর্বশেষ এই বক্তব্য এবং সরকারের সাথে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সংলাপে তেমন কোন মৌলিক অগ্রগতি সাধিত হয়নি। অতএব, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানে সরকারের সদিচ্ছা বা আন্তরিকতার বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে বলা যায়। এটা অন্তত স্পষ্ট যে, সরকার চট্টগ্রাম বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, যে কারণে এ সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানে এখন পর্যন্ত সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নেই। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের প্রেক্ষাপটে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিগত এরশাদ সরকার ও বর্তমান খালেদা জিয়া সরকারের মধ্যে এ পর্যন্ত কোনো মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়নি।

সা সাঃ কমিটি ফর চিটাগাঙ হিলট্র্যাক্স (সি এইচ টি)-এ যারা আছেন, তারা সবাই সংসদ সদস্য। তাদের কি কখনো জিজ্ঞেস করেছেন সংসদে সি এইচ টি নিয়ে আলোচনা হয় কিনা? হলে তা কতোখানি এবং কোন প্রেক্ষাপটে আলোচনা হয়েছে?

সন্তুঃ হ্যাঁ। অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তবে সি এইচ টি কমিটিতে বিরোধী দলের যারা রয়েছেন, তারাই শুধু বলেছেন যে, তাঁরা সি এইচ টি সমস্যা ও এ সমস্যা সমাধানের উপর সংসদে বক্তব্য রেখেছেন এবং সমাধানের কথা রেখে সি এইচ টি বিষয়ে আলোচনার জন্য বার বার দাবী উত্থাপন করে আসছেন। কিন্তু সরকারী দলের পক্ষ থেকে এ যাবৎ কোনো সাড়া না পাওয়ায় এ বিষয়ে সংসদে যথার্থ কোনো আলোচনাই হতে পারেনি। বস্তুত, সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও এ সমস্যা সমাধানের উপর আলোচনার্থে বিরোধী দলসমূহ থেকে দলগতভাবে কোনো প্রভাব আনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এ যাবৎ সংসদে যা কিছু বক্তব্য দেওয়া হয়েছে সে সব একান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ের ছিল বলে জানি।

সা সাঃ যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মিনিটস্ রাখা হয়। আপনাদের সঙ্গে সরকারের সংলাপ, আলোচনার তেমন মিনিটস আছে কি? এছাড়া পরের মিটিংয়ের আগের মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হয় কি? কিংবা আগের মিটিংয়ের সঙ্গে পরের মিটিংয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় কি?

সন্তুঃ অবশ্যই মিনিটস থাকে। কিন্তু এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, আমাদের উভয়পক্ষের আলোচনার কোনো মিনিটস্ নেই। মিনিটস্ রাখার জন্য জে এস এস এর পক্ষ থেকে বার বার বলা হয়েছিল, কিন্তু সরকার পক্ষের দলনেতা তথা সরকার পক্ষ মিনিটস্ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে পরবর্তীকালে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, বৈঠকে যা যা আলোচিত হবে তা স্ব স্ব পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং পরে তা উভয়পক্ষ থেকে মিলিয়ে দেখা হবে। সরকার পক্ষের এই অবাস্তব প্রস্তাব আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিগত সরকারের আমলেও প্রতিটি বৈঠকের মিনিটস রাখা হয়েছিল। অথচ খালেদা জিয়া সরকার একটা নির্বাচিত সরকার হয়েও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে অপারগতা দেখিয়েছে, যা সরকারের অসদিচ্ছারই

বহিঃপ্রকাশ বলে প্রতীয়মান হয়। এটাও অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য যে, আগের মিটিংয়ের সঙ্গে পরের মিটিংয়ের ধারাবাহিকতা যেমন রক্ষা করা হয় না, তেমনি পরের মিটিং-এর সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হয় না বলা যায়। প্রতিটি বৈঠক এজেণ্ডা ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়, আর বৈঠকে সরকার পক্ষের দলনেতার উত্থাপিত বক্তব্যই শেষ পর্যন্ত এজেণ্ডা হিসেবে প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

সা সা : পার্বত্য গণপরিষদ ও সমন্বয় পরিষদ সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করার জন্য। এই ধরনের প্রস্তাবে আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

সন্তু : পার্বত্য গণপরিষদ ও বাঙালী সমন্বয় পরিষদ সরকার ও অন্যান্য শক্তির মদদে ও ছত্রছায়ায় গঠিত হলেও এসব সংগঠনের জুম্ম জাতি বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকতা ও নাশকতামূলক তৎপরতা চলমান সংলাপের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম বলে মনে হয় না। তবে সরকার যদি চলমান বৈঠক বন্ধ করতে চায়, তাহলে এ প্রকারের সরকারি তাঁবেদার ও মদতপুষ্ট সংগঠনের দাবির অজুহাত দেখিয়ে বৈঠক বন্ধ করার অপচেষ্টা হতে পারে বৈকি।

সা সা : গত ডিসেম্বরে সংসদে তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকার বলেছে, শান্তি আলোচনার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু আলোচনার সঙ্গে নির্বাচন পিছানোর কি সম্পর্ক?

সন্তু : শান্তি আলোচনার সঙ্গে তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বস্তুত কোনো সম্পর্ক নেই। নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত একান্তই সরকারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যেহেতু এই স্থানীয় সরকার পরিষদ গণধিকৃত ও অবাঞ্ছিত বলে প্রমানিত হয়েছে, আর পক্ষান্তরে সরকার এই অগণতান্ত্রিক, ত্রুটিপূর্ন ও গণধিকৃত আইন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের বিরুদ্ধে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর, তাই, এমন অবস্থায় এই স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে ও শান্তি প্রক্রিয়ার উপর আঘাত দিতে পারে এই আশঙ্কায় মনে করা হয় সরকার এ নির্বাচন পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গণস্বার্থ পরিপন্থী এই আইনকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েছে।

সা সা : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শরণার্থীরা দেশে ফেরা শুরু করে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কিছু দিন পরেই হটাৎ করেই শরণার্থী প্রত্যাবাসন বন্ধ হয়ে যায়। কারণ কি?

সন্তু : জুম্ম রিফিউজি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এ সম্পর্কে এসোসিয়েশনের ১৩ মে, ১৯৯৪ তারিখে প্রকাশিত রিপোর্টে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। উক্ত রিপোর্টের মূল কথা হচ্ছে যে, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ১৬ দফা গুচ্ছ প্রস্তাব যথাযথভাবে বাস্তবায়ণ করা হচ্ছে না এবং প্রত্যাবাসিত ৩৭৯ পরিবারের মধ্যে অধিকাংশ পরিবার স্ব-স্ব ভিটেমাটিতে পুনর্বাসিত হতে পারেনি।

সা সা : পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জে এস এস) কি শরণার্থী প্রত্যাবাসন বন্ধ রাখার ব্যাপারে একমত?

সন্তু : জুম্ম শরণার্থী সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত একটা সমস্যা। এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে চাইলে প্রথমত ও প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। শরণার্থী প্রত্যাবাসনের বিষয়টি একান্তই সরকারের ব্যাপার। তবে জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে বরাবরই যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে আসা হচ্ছে।

সা সা : শান্তিবাহিনী পুনরায় দাবি করছে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন স্থগিত করার জন্য। শান্তিবাহিনী কি শরণার্থীদের জিম্মি রেখে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছে?

সন্তু : না। শান্তিবাহিনী কোনো সময়েই শরণার্থী প্রত্যাবাসন বন্ধ করার জন্য দাবি জানায়নি। জুম্ম

জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসকরণ ও ভূমি বেদখলের হীন ষড়যন্ত্রের কারণেই শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান না করেই শুধুমাত্র শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনলেই যেমন শরণার্থী সমস্যার সমাধান হতে পারে না, তেমনি শরণার্থীদের বিদেশে জিম্মি রেখেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হতে পারে না। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি তার নিজস্ব প্রোগ্রাম ৫ দফা দাবি-নামা ঘোষণা ও সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেছে। সুতরাং যারা শরণার্থীদের জিম্মি রাখার কথা বলে থাকে, তারা (বিশেষ মহল) প্রকৃতপক্ষে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস করে তাদের ভিটে-মাটি ও জমি বেদখল করতে একান্ত আগ্রহী।

সা সা : শরণার্থীরা কি নিজ ইচ্ছায় প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক, না কি সরকারী উদ্যোগে?

সন্তু : এ বিষয়টা জুম্ম শরণার্থীরাই ভালো বলতে পারবে।

সা সা : জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির হিসাব অনুযায়ী রেজিষ্টার্ড ও আনরেজিষ্টার্ড শরণার্থী কত?

সন্তু : জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির বর্তমান রিপোর্ট অনুসারে ৫১,৩৭৯ জন রেজিষ্টার্ড এবং ৭,১২২ জন আনরেজিষ্টার্ড শরণার্থী রয়েছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশ সরকার এই সংখ্যা নিয়ে কোন আপত্তি জানিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

সা সা : বেশ কিছুদিন আগে কল্পরঞ্জন চাকমা এম পি 'ভোরের কাগজে' এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, শরণার্থীরা দেশে ফিরে আসছেন এবং তারা জমিজায়গা ফেরত পেয়েছেন। কথাটি কি ঠিক?

সন্তু : শ্রীকল্পরঞ্জন চাকমা এম পি তার নিবন্ধে যা উল্লেখ করেছেন তা সঠিক নয়। কারণ এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ প্রত্যাবাসিত শরণার্থী পরিবার স্ব-স্ব গ্রামে পুনর্বাসিত হতে পারেনি। শ্রীকল্পরঞ্জন চাকমা এম পি সরকারের বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র।

সা সা : ৭০ দশকের মাঝামাঝিতে দিল্লি শান্তি বাহিনীকে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য সীমিত পরিমাণে অস্ত্র দিয়েছিল বলে বিশস্ত সূত্রে আমরা জেনেছি। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

সন্তু : কোনো সময়ে দিল্লী শান্তি বাহিনীকে অস্ত্র দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। কায়েমি স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, যারা পাঁচ দফা দাবির বিরোধিতা করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে চায় এবং যারা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস ও জমির অধিকার হরণ করে নিতে বদ্ধপরিকর, তারাই এ ধরণের গুজব ছড়ায়।

সা সা : বর্তমানে জে এস এস-এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কোন পর্যায়ে রয়েছে?

সন্তু : জে এস এস বাংলাদেশেরই একটা রাজনৈতিক সংগঠন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মধ্যে থেকে, জুম্ম জনগণের তথা বাংলাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল হিসেবে সংগঠিত হয়েছে। জে এস এস জুম্ম জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। সুতরাং জে-এস এস-এর ন্যায় বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক দলের সাথে ভারত বা বাইরের অন্য কোনো দেশের সম্পর্ক থাকার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর ও অবাস্তব।

সা সা : ভারত সরকার কি জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সঙ্গে একমত?

সন্তু : প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অবান্তর। কেননা, এটা একান্তই ভারত সরকারের নিজস্ব ব্যাপার।

সা সা : বাংলাদেশ প্রায়ই ভারতকে অভিযুক্ত করে বলে যে, ভারত 'সন্ত্রাসী'দের মদত দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এব্যাপারে আপনাদের মতামত কি?

সন্তু : অবান্তর ও অবাস্তব প্রশ্নের উপর কোন মতামত থাকতে পারে না।

[সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় অংশ]

সা সা : ইদানীং জে এস এস পরিবর্তিত আকারে ৫ দফা রূপরেখা উল্লেখ করছে। আগের ৫ দফার সঙ্গে বর্তমান ৫ দফার মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে ?

সন্তু : ৫ দফাতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে সংশোধিত ৫ দফা দাবিনামায় আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করার দাবি রয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।

সা সা : বাংলাদেশ সরকার পার্বত্যবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার মেনে নেওয়ার পরে যদি প্রশ্ন ওঠে, এতে সমতলবাসীর কি লাভ হয়েছে ? সে ক্ষেত্রে আপনাদের বক্তব্য কি হবে ?

সন্তু : পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। সুতরাং এ সমস্যার যদি সমাধান হয় তাহলে বাংলাদেশের আপামর জনগণেরই লাভ।

সা সা : জে এস এস কি মনে করে সমতলবাসীরা তাদের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি মেনে নেবে ?

সন্তু : যারা বাংলাদেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে এবং যারা গণতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও প্রকৃত জাতীয়তাবাদী তারা অবশ্যই এই স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সমর্থন জানাবেন।

সা সা : স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাওয়ার পর তা বাস্তবায়নের জন্য জে এস এস এর তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ কি কি হবে ?

সন্তু : সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যকার গৃহীত চুক্তি মোতাবেক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বাস্তবায়িত হবে।

সা সা : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহীদলরা তাদের আকাংখিত অধিকার পাওয়ার পর ক্ষমতাসীন হয়ে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছে। এ ক্ষেত্রে জে এস এস এমন পরিস্থিতি ওভারকাম করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেবে ?

সন্তু : পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অসংগতিপূর্ণ। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, আর জে এস এস আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্যই আন্দোলন করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতি গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সামাজিক স্বায়বিচারে বিশ্বাসী একটা রাজনৈতিক দল।

সা সা : স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায়ের পর শান্তি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পদ্ধতি কি হবে এবং সামাজিকভাবে তাদের পুনর্বাসন করা হবে কিভাবে ?

সন্তু : আগে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়াই হচ্ছে মুখ্য বিষয়।

সা সা : স্বায়ত্তশাসন পাবার পর চাকমা, মারমা এবং মং রাজার পদমর্যাদা কিভাবে নির্ধারণ করা হবে ?

সন্তু : জনসংহতি সমিতি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সুতরাং অন্যান্য যেকোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়টাও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত হতে পারে।

সা সা : স্থানীয় সরকার পরিষদ ইউনিয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন কল্যাণ পরিষদের অবস্থা কি হবে ?

সন্তু : আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন নির্ধারিত হবে।

সা সা : পার্বত্য চট্টগ্রামে দশটি ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হবার পর আঞ্চলিক পরিষদকে আলোচনায় কোন ভাষা ব্যবহার করা হবে ?

সন্তু : বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে বাংলা। তাই আঞ্চলিক পরিষদেও বাংলাভাষাই প্রধান ভাষা হচ্ছে

পারে। আর ইংরেজী ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সা সা ঃ জে এস এস-এর দাবি পার্বত্য এলাকা থেকে বাঙালি অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কার করা হোক। এদিকে দেখা যাচ্ছে, আঞ্চলিক পরিষদে বাঙালিদের জন্য ৩টি আসন রিজার্ভ রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে এক ধরণের বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না কি?

সন্তু ঃ ১৯৪৭ সালের ১৭ আগষ্টের পূর্ব পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সমস্ত বাঙালি ছিলেন তারা অবশ্যই অনুপ্রবেশকারী নন। তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে এ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়া হয়ে আসছে। সাধারণভাবে তারা পুরাতন বসতি বাঙালি হিসেবে পরিচিত। সুতরাং এক্ষেত্রে কোনো ধরণের বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

সা সা ঃ বি এন পি, আওয়ামীলীগ, জামাত, জাতীয় দল সবাই রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছে। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের কথা কোনো দল সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে কি বলে আপনি মনে করেন?

সন্তু ঃ কতিপয় রাজনৈতিক দল স্বায়ত্তশাসনের কথা তুলে ধরলেও কোনো দল কর্তৃক এ পর্যন্ত এই স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা কিরকম হবে তা সুস্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়নি।

সা সা ঃ অস্ত্রবিরতি থাকাকালীন জে এস এস কি মনে করে সামরিক তৎপরতা আগের থেকে অনেক কমেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী প্রশাসনের ওপর সামরিক আমলাদের প্রভাব কি কমেছে বলে মনে করেন? এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কি এখন বেসামরিকীকরণ হয়েছে বলে মনে করেন?

সন্তু ঃ না। বাহ্যত পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসনের উপর সামরিক আমলাদের প্রভাব যুদ্ধবিরতিকালে কমেছে বলে মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে জুম্ম জনগণের উপর সন্ত্রাস ও দমননীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণেরও কোনো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত বাংলাদেশ বাহিনী যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী লংঘন করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ এখনো চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জি ও সি'র হাতে ন্যস্ত রয়েছে।

সা সা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে সামরিক আমলারা কি আগ্রহী? এ ব্যাপারে জে এস এস-এর অভিমত কি?

সন্তু ঃ বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে বরাবরই এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে একটা রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। সুতরাং, এ সমস্যার একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে সামরিক আমলাদের আগ্রহ ও অনুকূল ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

সা সা ঃ আমাদের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির সময়ে নিরাপত্তা বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ীদের বাধ্যতামূলক শ্রম (ফোর্স'ড লেবার) নিয়োগ বন্ধ করেছে। এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? রাজনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি সরকারের এমনেষ্টি ঘোষণার বিষয়টিকেই বা আপনারা কিভাবে মূল্যায়ন করছেন?

সন্তু ঃ বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যেকোন ধরণের বাধ্যতামূলক শ্রম (জবরদস্তিমূলক শ্রম) নিষিদ্ধ হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এই আইন কার্যকর করা হচ্ছে না। কেননা, জুম্ম জনগণকে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োগ করা কোনো সময়েই বন্ধ করা হয়নি। যুদ্ধবিরতির সময়েই হোক বা অন্য যেকোনো সময়েই হোক, এ পর্যন্ত নানাভাবে জুম্ম জনগণকে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োগ করে একদিকে তাদেরকে নির্যাতন-নিপীড়ন করা হচ্ছে আর অন্যদিকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের মনোবল ও ঐক্যশক্তি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন নস্যাৎ

করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগের ও বর্তমান সরকারগুলো বার বার তথাকথিত সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে আসছে। অথচ এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের প্রেক্ষাপটে সরকারের সততা ও আন্তরিকতা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

সা সা : এমনেষ্টির সময়ে শান্তিবাহিনীর কতোজন সদস্য এই সুযোগ গ্রহণ করেছে? যারা সুযোগ নিয়েছে তাদের আত্মসমর্পণের নেপথ্যে কি কারণ রয়েছে?

সন্তু : ভবতোষ-প্রীতি- দেবজ্যোতি-ত্রিভঙ্গিল—এই চার কুচক্রী বিভেদপন্থীদের ষড়যন্ত্রের ফলে ১৯৮২ সালে যখন পার্টিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন থেকেই বাংলাদেশ সরকার তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দিয়ে আসছে। এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্টিতে ভাঙন সৃষ্টি করে দিয়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন নস্যাৎ করে দেওয়া। অবশ্য এটা কারো অজানা নয় যে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা কাউন্টার ইনসারজেন্সির অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। তা সত্ত্বেও দলীয় কর্মীদের মধ্যে অনেকেই সরকারের এই ফাঁদে পা দিতে দ্বিধাবোধ করে না। ১৯৮২ থেকে ১৯৯৪ সালের জুন পর্যন্ত আত্মসমর্পিত বিভেদপন্থীদের বাদে ২৫৭ জন শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতির ২৫৭ জন সদস্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করেছে। তথাকথিত এ সুযোগ গ্রহণের নেপথ্যে অনেক কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে শারীরিক অযোগ্যতা, ক্লান্তি ও হতাশা, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা, দীর্ঘদিন পর্যন্ত কঠোর জীবনযাপন অপারগতা দুর্নীতিগ্রস্ততার কারণে পার্টি থেকে বহিস্কৃত হওয়া, নীতি-আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ইত্যাদি।

সা সা : বিভিন্নভাবে সরকারী বাহিনীর কাছে শান্তিবাহিনীর যেসব সদস্য আত্মসমর্পণ করেছে। পরবর্তী-কালে তাদের অনেকেই আবার শান্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। তাহলে তাদের অপরাধ কি আত্মসমর্পণ করা?

সন্তু : এ প্রকার কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। শান্তিবাহিনী তথা পার্টির ভাবমূর্তির ওপর আঘাত হানার জন্যই কায়েমি স্বার্থ-বাদীরা এ রকম অপবাদ দিয়ে থাকে।

সা সা : বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের হার তুলনামূলকভাবে কি কমেছে?

সন্তু : অবশ্যই কমেনি। এখনো প্রতিদিন পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো না কোনো অঞ্চলে জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘন করা হচ্ছে।

সা সা : জে এস এস এর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব কমেছে কি?

সন্তু : এখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা পরিস্কার নয়। তবে আশির দশকের গোড়ার দিকে উপদলীয় চক্রান্তকারী ভবতোষ (গিরি), প্রীতি কুমার (প্রকাশ), দেবজ্যোতি (দেবেন), ত্রিভঙ্গিল (পলাশ)-এর ষড়যন্ত্রে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল সেরকম কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা এখানে যদি বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে তার উত্তরে বলবো যে—না। পার্টিতে সেরকম কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। বরং বলা যায়, জে এস এস-এর নেতৃত্ব আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ, সংগ্রামী, সংহত ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

সা সা : জে এস এস কি হিল ট্র্যাক্স ম্যানুয়েল ১৯০০ রাখতে চায় নাকি সেটার পরিবর্তন করতে চায়?

সন্তু : পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমা-ধানের লক্ষ্যে জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই জে এস এস পাঁচদফা দাবিনামা আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের নিকট উপস্থাপন করেছে।

সা সা : জে এস এস পার্বত্য এলাকার কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ এবং কি কি বিষয় নিষিদ্ধ করতে চায়?

সন্তু : জে এস এস কতৃক উপস্থাপিত পাঁচ দফা দাবি ও আঞ্চলিক পরিষদ এর রূপরেখায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে।

সা সা ঃ পাহাড়ী গণপরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন কি জে এস এস এর অঙ্গ সংগঠন? কারণ তাদের রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে আপনাদের রাজনৈতিক দাবির মিল রয়েছে।

সন্তু ঃ না। এসব সংগঠন জনসংহতি সমিতির কোনো অঙ্গ সংগঠন নয়। জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে এসব সংগঠনের দাবির কোনো সাদৃশ্য থাকলে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতার কারণেই হয়েছে বলে বলা যেতে পারে।

সা সা ঃ পার্বত্য এলাকার সরকারের কোটি কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই উন্নয়ন পাহাড়ীদের ভাগ্যোন্নয়নে কতোখানি সহায়ক বলে আপনি মনে করেন?

সন্তু ঃ এটা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার জুম্ম জনগণের উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সিংহভাগই পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনীর ব্যয়ভার, অনুপ্রবেশকারীদের পূনর্বাসন ও কাউন্টার ইনসারজেন্সিতে ব্যয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন সরকার যখন নীতিগতভাবে জুম্ম জনগণের' বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে সেক্ষেত্রে উক্ত কোটি কোটি টাকায় তথাকথিত প্রকল্প জুম্ম জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়ক হওয়ার কথা একান্তই অবাস্তব ও অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়।

সা সা ঃ জে এস এস কি তাদের আন্দোলনের ব্যাপারে পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্বার সমর্থন আদায় করতে পেরেছে? আর এই আন্দোলন চালাতে সামরিক এবং প্রশাসনিক যে বিশাল ব্যয়, তা কিভাবে সংগ্রহ করা হয়?

সন্তু ঃ জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। আর এই সংগঠন দশটি ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণ নিয়েই গঠিত হয়েছে ও জুম্ম জনগণের সক্রিয় সমর্থনে সুদীর্ঘ ২২ বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। যেহেতু জনসংহতি সমিতি ও এর সামরিক সংগঠন শান্তিবাহিনী ব্যাপক জুম্ম জনগণের সমর্থনপুষ্ট, তাই জুম্ম জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান ও সাহায্য নিয়েই জনসংহতি সমিতির ব্যয়ের সিংহভাগই মেটানো হয়ে থাকে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবসাবাণিজ্য ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের থেকেও চাঁদা সংগ্রহ করেও আন্দোলনের আংশিক খরচ মেটানো হয়। সর্বোপরি জনসংহতি সমিতির নিজস্ব উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকেও পার্টির ব্যয়ভার আংশিকভাবে লাঘব করা হয়ে থাকে।

সা সা ঃ জে এস এস বর্তমান কাঠামোর এবং শান্তিবাহিনীর কাঠামোর স্বরূপটি কি?

সন্তু ঃ জে এস এস একটি রাজনৈতিক দল। এর অনেকগুলো অঙ্গ সংগঠন রয়েছে। তার মধ্যে সামরিক সংগঠন হিসেবে শান্তিবাহিনী ও মিলিশিয়া বাহিনী রয়েছে। জে এস এস এর নেতৃত্বেই শান্তিবাহিনীসহ অন্য সব অঙ্গ সংগঠন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, জে এস এস এর কাঠামোর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। পূর্বের মতোই কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পার্টির সমস্ত সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে।

সা সা ঃ আপনাকে আমরা মৃত বলে জানতাম হটাৎ জানা গেলো আপনি জে এস এস এর সভাপতি। এই গুজব সৃষ্টি হলো কিভাবে?

সন্তু ঃ এটা তারাই ভালো বলতে পারবে যারা আমাকে মৃত বলে গুজব ছড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, পার্টির মধ্যে তাণ্ডব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এবং আন্দোলনে বিভ্রান্তি আনার উদ্দেশ্যেই কায়েমি ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এ গুজব সৃষ্টি করেছিল।

সা সা ঃ দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আপনার অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে শান্তিবাহিনীর মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি আসে এবং চরম সঙ্কট দেখা দেয়। তারই পরিণতিতে মানবেন্দ্র লারমার মৃত্যু ঘটে এবং শান্তিবাহিনীর ২ হাজার সদস্য সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এ সঙ্কটকে কি আপনারা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন?

সন্তু : কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমার অন্তর্ভুক্তির কারণে পার্টিতে চরম সঙ্কট দেখা দেয় ও পরিণতিতে পার্টি প্রতিষ্ঠাতা ও জুম্ম জনগণের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র লারমার মৃত্যু ঘটেছে, কথাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কারণ আমি জনসংহতি সমিতির জন্মলগ্ন থেকে এ যাবৎ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছি। এমনকি আমি যখন বিনাবিচারে অন্তরীণ ছিলাম সেই সময়েও আমাকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়নি। ১৯৭৭ সালে জাতীয় সম্মেলনে (আমি যখন জেলে ছিলাম) আমাকে ফিল্ড কমাণ্ডারের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। ১৯৮০ সালের গোড়ার দিকেই বিনাশর্তে কারামুক্ত হই। কিন্তু ১৯৮১ সালের ১৯ মার্চ পুনরায় আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে মুক্তিলাভের পর পরই আমি আবার আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে চলে আসি এবং ফিল্ড কমাণ্ডারের দায়িত্বসহ কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্বভার পালন করতে থাকি। এর পরে ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনে আমি পুনরায় বিপুল ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হই। আর কার্য্যকরী কমিটির একজন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর পরই আমাকে পুনরায় শান্তিবাহিনী ও মিলিটারী বাহিনীর ফিল্ড কমাণ্ডার হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়।

বস্তুত ভবতোষ, প্রীতিকুমার, দেবজ্যোতি ও ত্রিভঙ্গিল—এই চার কুচক্রীর ষড়যন্ত্রের ফলে পার্টিতে উপদল সৃষ্টি হয়। এই চার কুচক্রী ক্ষমতার লোভে ও দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার হীন উদ্দেশ্যে সর্বোপরি নীতি-আদর্শ ভ্রষ্ট হয়ে কায়েমি স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মদতেই পার্টির অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। ফলতঃ পার্টিতে ১৯৮৩ সালের গোড়ার দিকে চরম সঙ্কট দেখা দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কারামুক্ত হওয়ার পর পুনরায় আমার আত্মগোপনে চলে আসার আগেই কিন্তু চার কুচক্রীর এই উপদলীয় চক্রান্তের জাল অনেক বিস্তার লাভ করে। ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনে এই ষড়যন্ত্রের পূর্ণমাত্রায় বিস্ফোরণ ঘটে, যদিও জাতীয় সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনে চার কুচক্রী চরমভাবে পরাজিত হয়। তা সত্ত্বেও চার কুচক্রী বিভেদ-পন্থীরা অচিরেই আবার ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে আরম্ভ করে। কিন্তু পার্টির নেতা, নেতৃত্ব ও নীতি-আদর্শের প্রতি অনুগত অবিচল সংগ্রামী কর্মীবাহিনী এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসে। ফলশ্রুতিতে বিভেদপন্থীরা শান্তি প্রস্তাব নিতে বাধ্য হয় এবং নতুন উদ্যোগ সম্মিলিতভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার প্রদান করে। শর্তসাপেক্ষে উভয়পক্ষ একটা শান্তি চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু ওই শান্তি চুক্তি লংঘন করে চার কুচক্রী রাতের অন্ধকারে গোপনে ১০ নভেম্বর, ১৯৮৩ তারিখে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, নিপীড়িত জাতি ও মেহনতি মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু মানবেন্দ্র লারমাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পার্টির অভ্যন্তরে এই চরম সঙ্কটের ফলে চারশতাধিক বিভেদপন্থী সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে, আর সেই সাথে পার্টির বেশ কিছু সংখ্যক নিষ্ঠাবান কর্মীও বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিষ্ক্রিয় হায় যায়। তথাপি সঠিক নীতি, আদর্শ ও নেতৃত্ব এবং সেই সাথে বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান, সংগ্রামী কর্মীবাহিনী ছিল বলেই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন থেমে যায়নি। বরং প্রতিক্রিয়াশীল, দুর্নীতি-বাজ, ক্ষমতালোভী, আদর্শহীন ও সুবিধাবাদী উপদলীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কারণেই যেমন আন্দোলন অধিকতর গতি সঞ্চারিত হয়েছে, তেমনি দলীয় নেতৃত্ব নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে আরো ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হয়েছে।

সা সা : বর্তমানে জে এস এস-এর বাঙালী বসতির ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত?

সন্তু : ১৯৪৭ সালের ১৭ আগষ্টের পর থেকে অনু-প্রবেশকারীদের বহিরাগতদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবি করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আলোচনার অবকাশ রয়েছে বলে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের নিকট অভিমত দেওয়া হয়েছে।

সা সা : আপনারা কিছুদিন আগে বাঙালী বসতি-কারীকে অনুপ্রবেশকারী বলতেন। এখনো কি তাদের এ বিশেষণেই আখ্যায়িত করছেন?

সন্তু: ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিনানুমতিতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন কোনো ব্যক্তিই পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি ক্রয় বন্দোবস্ত বসতি স্থাপন করতে পারেন না। সুতরাং ১৯৪৭ সালের ১৭ আগষ্ট থেকে এ পর্যন্ত যারা অনুপ্রবেশ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছে সেসব বহিরাগতদের প্রত্যেককেই জনসংহতি সমিতি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে আসছে।

সা সা : আগে জে এস এস/শান্তিবাহিনীর বিভিন্ন প্রচারপত্রে কিংবা প্রকাশনায় লেখা থাকতো, শান্তিবাহিনী হেডকোয়ার্টার, দীঘিনালা'। এখন আপনাদের প্রকাশনায় কোনো ঠিকানা লেখা থাকে না। তবে কি শান্তিবাহিনীর বর্তমান কোনো হেডকোয়ার্টার নেই?

সন্তু। জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীসহ পার্টির অন্য কোনো অঙ্গ সংগঠনের প্রচারপত্রে কিংবা প্রকাশনায় এ পর্যন্ত কোনো সময়েই জনসংহতি সমিতি অথবা শান্তিবাহিনীর অথবা অন্য কোনো অঙ্গ সংগঠনের হেডকোয়ার্টারের নাম উল্লেখ করা হয়নি। বস্তুত শান্তিবাহিনীর কোনো আলাদা হেড কোয়ার্টার নেই। পার্টির হেডকোয়ার্টারই হচ্ছে শান্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার। সুতরাং, যেসব প্রচারপত্রে ও প্রকাশনায় শান্তিবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স দীঘিনালা' লেখা আছে সেসব প্রচারপত্র বা প্রকাশনা অবশ্যই সরকারকে মদতপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল দালালগোষ্ঠি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিল।

সংবাদ

প্রত্যাগত শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জেলা প্রশাসকের বৈঠক

গত ২৪ শে আগষ্ট '৯৫, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ১৬ দফা বাস্তবায়ন কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত নন। বিগত ১২ ই জুলাই সাংসদ জনাব রাশেদ খান মেনন প্রত্যাগত শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের সমস্যাবলীর বিষয়ে আলোচনায় বসতে ধুদুকছড়া গ্রামে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বিশ্বস্ত সুত্রে জানা যায় উক্ত বৈঠকে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইসমাইল নিম্নোক্ত বিষয়াদি মন্তব্য করেন।

১। জমির মালিকানা নিয়ে যে সব প্রত্যাগত শরণার্থীদের বিরুদ্ধে বাঙালী বসতিকারীরা ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছে সেগুলি বিচার বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত। তিনি কিছুই করতে পারবেন না। যেহেতু শাসন বিভাগের করার কিছুই নেই।

২। প্রত্যাগত শরণার্থীরা তাদের নিজ নিজ জায়গা-জমি ফেরত পাবার পর যদি বাঙালী বসতিকারীরা যেসব পুন: দখল করে নেয় তাহলে প্রশাসন কিছুই করতে পারবে না।

৩। শরণার্থীদের দেয়া ১৬ দফা প্রতিশ্রুতিতে রাষ্ট্র, সরকার কিংবা স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ জড়িত নয় এবং এই পক্ষ থেকে কেউ এই প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করেনি। এটা শ্রীসাংসদ শ্রীকল্পরঞ্জন চাকমা ও সাংসদ জনাব রাশেদ খান মেনন করেছেন। তাই প্রত্যাগত শরণার্থী নেতৃবৃন্দ ঐ দু'জন সাংসদের নিকট যেতে পারেন।

৪। গৃহ নির্মাণের জন্য পরিবার পিছু ২০০ ঘনফুট গাছের পারমিট প্রদান, পরিবার পিছু পাঁচ হাজার

টাকা বরাদ্দ, ভূমিহীনদেরকে এক জোড়া হালের বলদের সমপরিমাণ টাকা মঞ্জুর করা সম্ভব নয়।

প্রাপ্ত খবরে জানা যায় মোহাম্মদ ইসমাইলের উল্লেখিত মন্তব্যে প্রত্যাগত শরণার্থী নেতৃবৃন্দ মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ফলে ৩য় পর্যায়ের প্রত্যাবাসন কাজ ব্যাহত হবে বলে সকলেই ধারণা করছেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রহৃত

শ্রীমৎ উকেচোরা ভিক্ষু (৫০) ও তাঁর কতিপয় সঙ্গী অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মুসলমান শ্রমিকের হাতে বিনা-উস্কানীতে বেদমভাবে প্রহৃত হয়েছেন। খবরে জানা যায়-বিগত ৩১ শে মে খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি-জালিয়া পাড়া রাস্তার এক স্থানে ১৪।১৫ জন অনুপ্রবেশকারী মুসলমান শ্রমিক রাস্তার কাজ করছিল। বিকাল আনুমানিক ৩ ঘটিকায় রামগড় থানাধীন জগৎ শান্তি বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ উকেচোরা ভিক্ষু তাঁর কতিপয় দায়ক-দায়িকাসহ ঐ স্থানে পায়ে হেঁটে পৌঁছলে কর্মরত শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে বিভিন্ন কটুক্তি ও উপহাস করতে শুরু করে দেয়। উক্ত ভিক্ষুর এক দায়ক সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করে। ফলে শ্রমিকরা ঝগড়া লাগিয়ে দেয় এবং এই সুযোগে শ্রমিকরা উক্ত ভিক্ষুসহ তাঁর সঙ্গীদেরকে ভীষণভাবে মারধর করে। নিকটবর্তী ২ নম্বর রোড প্রোটেকশান পোষ্ট এর সেনা সদস্যরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

নিম্নলিখিত শ্রমিকরা মারধরের সময় নেতৃত্ব দেয় বলে জানা যায়:

১। নজরুল ইসলাম, পিতা- অহিদ সরকার, গ্রাম-বড় পিলাক গুচ্ছগ্রাম, মৌজা- ২০৯ নং বড় পিলাক, থানা রামগড়।

২। আব্দুল আলী, পিতা- সরুজ মিস্ত্রি, ঠিকানা- ঐ।

৩। কাসেম, পিতা- আলাউদ্দীন, ঠিকানা- ঐ।

৪। স্বপন, পিতা- আবুল বশর, ঠিকানা- ঐ।

বহিরাগত বাঙালী মুসলিম কর্তৃক ৩ জন জুম্ম নারী ধর্ষিতা

বিগত ৮ই জুন '৯৫ইং মোহম্মদ আতাউল হক, পিতা-মোঃ আবুল কাসেম, ইউ পি মেম্বার, গ্রাম-লটবল, উগলছড়ি মুসলিম পাড়া, থানা-বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা, সকাল আনুমানিক ৭টার সময় শ্রীমতী সূর্যমুখী চাকমা, স্বামী-শ্রীচন্দ্রমোহন চাকমা, গ্রাম-১নং রাবার বাগান (বাঘাইছড়ি), ইউ পি বাঘাইছড়ি, ৩৭৯নং বাঘাইছড়ি, মৌজা-কে ধর্ষণ করে।

১২ ই জুন '৯৫ইং রাত অনুমানিক ৯ ঘটিকার সময় মোঃ নুরুল আলম, পিতা-মুন্সি মিঞা, গ্রাম-লটবন উগলছড়ি মুসলিম পাড়া, থানা বাঘাইছড়ি এর নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একদল বাঙালী মুসলিম দুস্কৃতিকারী শ্রীমতী স্বপ্না চাকমা (২০), স্বামী শ্রী উজ্জল কান্তি চাকমা (সদ্য বিবাহিতা), গ্রাম-দক্ষিণ খাগড়াছড়ি, থানা-বাগাইছড়ি, ৩৮৪ নং সার্বোতলী মৌজা-কে উগলছড়ি লটবনস্থ তার পিতার খামার বাড়ীতে পাশবিকভাবে গণধর্ষণ করে।

উল্লেখ্য যে, সদ্য বিবাহিতা উক্ত স্বপ্না চাকমার পিতা শ্রী হরি চন্দ্র চাকমা (৪০), পিতা-শ্রী বিমল চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-দক্ষিণ খাগড়াছড়ি, ৩৮৪ নং সার্বোতলী মৌজা, থানা-বাগাইছড়ি, উল্লেখিত অকুলস্থলে বর্গাজমি চাষ করতে খামার বাড়ী করেন। তার পিতাকে কাজে সাহায্য করতে উক্ত স্বপ্না ও তার জামাই পিতার খামার বাড়ীতে আসেন। ঘটনার দিন উল্লিখিত বাঙালী মুসলিম দুস্কৃতকারী দল তার পিতার খামার বাড়ী রাত অনুমানিক ৯ টায় ঘেরাও করে। খামার বাড়ীর অন্যান্য সবাইকে বের করে এক পার্শ্বে বেঁধে রাখে ও স্বপ্নাকে গণধর্ষণ করে। দুস্কৃতিকারী-দের অন্যান্য কয়েকজনের মধ্যে ১) মোঃ বালেইয়া, পিতা- জানা নেই, ২) মোঃ রহিম, পিতা-বাঁশখাল্যা বুড্যা এ দুজনের নাম জানা গেলেও অন্যান্যদের নাম জানা যায়নি। এ ব্যাপারে বাগাইছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হলেও এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অধিকন্তু বাঘাইছড়ি থানার ভার-

প্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও, সি) উৎকোচ দাবী করেছে এবং অপরাধ সংঘটনকারীদের কাছ থেকেও উৎকোচ গ্রহণ করে উক্ত ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে রাখার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে, ১৫ই জুন'৯৫ইং তারিখের এক ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, তিনজন অনুপ্রবেশকারী (১) আবুতাহের, (২) সুন্দর মিঞা ও (৩) মোঃ আলী, সাং ঝর্ণাটিলা, লংগদু, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা, মিস্ কল্পনা চাকমা (১৬), পিতা-শ্রী সাধন মুণি চাকমা, গ্রাম-মানিকবি ছড়া, লংগদু-কে মাইনীমুখ বাজার হ'তে ফেরার পথে পুরুষ সঙ্গীদের বেঁধে রেখে অমানবিক গণধর্ষণ করে বলে জানা যায়। সকলের ধারণা নিরাপত্তা বিধানকারী সদস্যদের পরোক্ষ ইন্ধনে মুসলিম বাঙালীরা জুম্ম নারীদের ধর্ষণ করে চলেছে।

শান্তিবাহিনীর প্রতিরোধ হামলায় সেনা সদস্য হতাহত

গত ১৪-২৩শে জুন '৯৫ইং ২৪ ই, বি, আর, নানিয়াচর জোন, ৩৩ ই, বি, আর, মহালছড়ি জোন, ১৫ ই বি, আর লক্ষীছড়ি জোন এবং গুইমারা ব্রিগেড হতে আনুমানিক এক হাজারের অধিক সেনা সদস্যের এক সম্মিলিত বাহিনী নানিয়াচর থানাধীন জরিপ্যা পাড়া, লারমা পাড়া, ভুরবো মহাজন পাড়া, তিবিরাছড়ি, সোনারাম কার্বারী পাড়া, পুরাতন বেতছড়ি, দার্ব্যাপাড়া রামসুপারী ছড়া, হাজাছড়া ও বাজেছড়া এবং লক্ষীছড়ি থানাধীন বানরকাটা, দুরছড়ি, নাভাঙ্গা, কুরুম ভাঙ্গা, আকবাড়ী মেম্বার পাড়া, দীঘলছড়িসহ প্রত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে এক ব্যাপক তল্লাসী অভিযান চালাতে থাকে। যুদ্ধবিরতি চলাকালীন সময়ে সেনাবাহিনীর এই ব্যাপক অভিযান শান্তিবাহিনীর হাইড আউটের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেলে ২১-২২-২৩ শে জুন শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা আত্মরক্ষামূলক হামলা চালাতে বাধ্য হয়। এতে ২১ তারিখে সেনাবাহিনীর ৩ জন নিহত ও ৪ জন আহত হয় বলে জানা যায়। ঘটনাস্থলে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা তল্লাসী চালিয়ে সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত সেলাইন ও ইনজেকশন উদ্ধার করেন। এই ঘটনার প্রতিশোধমূলকভাবে সেনারা কতিপয় নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীর ঘরবাড়ী তল্লাসী চালিয়ে জিনিষপত্র ও ফসলাদি নষ্ট করে দেয় ও ছাগল-মোরগ-মুরগী জোরপূর্বক নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

এছাড়া ২০শে জুন '৯৫ইং ১৭ ই বি আর মারিশ্যা জোনের অধীন করেঙ্গাতলী ক্যাম্পের মেজর জামাল মাহবুব চৌধুরী ৫০ জন সেনাসদস্যের একটি গ্রুপ নিয়ে শান্তিবাহিনীর অপারেশনে করেঙ্গাতলী প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। অর্ধপথে সেনাসদস্যরা ২টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আনাচে-কানাচে তল্লাসী অভিযান শুরু করলে প্রায় শান্তিবাহিনীর হাইড আউটের সন্নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা প্রতিরোধমূলক আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। এতে সেনাদলের ২ জন সদস্য ঘটনাস্থলে নিহত ও নেতৃত্বদানকারী মেজর স্বয়ং আহত হয় বলে জানা যায়।

এ ঘটনার প্রতিশোধ হিসাবে সেনারা ক্যাম্পে ফেরার পথে গ্রামে ঢুকে গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ী তল্লাসী চালিয়ে জিনিষ-পত্রাদি তচনচ করে দেয়। হাঁস-মুরগী-ছাগলও জোরপূর্বক নিয়ে যায়।

সুবেদার কর্তৃক জোরপূর্বক জমি প্রদান

অতি সম্প্রতি নিরাপত্তা রক্ষাকারী সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে অনুপ্রবেশকারী কর্তৃক জুম্ম জমি বেদখলের খবর পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু থানাধীন দক্ষিণ পাবলাখালীতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, দক্ষিণ পাবলাখালী নিবাসী শ্রী নিরঞ্জন চাকমা, পীং অনন্ত চাকমার জমি মোঃ মোবারক হোসেন, সাং—কালা পাগজ্যা, গোলটিলা, থানা-লংগদু, জেলা-রাঙ্গামাটি, জোরপূর্বক কেড়ে নেয়। গোলটিলা বি ডি আর ক্যাম্পের সুবেদার মোঃ আত্তিয়ারই ক্ষমতায় অপব্যবহার করে উক্ত নিরঞ্জন চাকমাকে বিভিন্ন হুমকি

প্রদানের মাধ্যমে উক্ত জমি বহিরাগত মুসলমান বাঙ্গালীর কাছে দখল ছেড়ে দিতে বাধ্য করে বলে জানা যায়।

নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের নামে একদিকে জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের সংলাপ এবং অন্য দিকে সংলাপের শর্তাধীনে যুদ্ধবিরতির সুযোগে বাংলাদেশ সেনারা নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপনের কাজ অব্যাহত রেখেছে।

গত ২রা মে '৯৫ইং গুইমারা ব্রিগেড (গোলন্দাজ) এর আওতাধীন মাটিরাঙ্গা জোন কর্তৃক মাটিরাঙ্গা থানার ২০৭নং ওয়াদ মৌজাস্থ থাংঠুং পাড়ার (ত্রিপুরা পাড়া) সন্নিকট স্থানে একটি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

এ মাসের ২য় সপ্তাহে দিঘীনালা থানাধীন ৫৬নং বড় হাজাছড়া মৌজাস্থ প্রদীপ কার্বারী পাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিমের এক স্থানে একটি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

এছাড়া ১২ই মে '৯৫ইং ৫৩ ই. বি. আর-এর মেজর মাহবুব এর নেতৃত্বে ১৮জনের এক সেনাদল ২২জন অনুপ্রবেশকারী মুসলমান কুলী দ্বারা খাগড়াছড়ি সদর থানাধীন ২৬৩নং কমলছড়ি মৌজার মুখে এক টিলার জঙ্গল কেটে ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। ২৩শে মে '৯৫ ইং তারিখে নানিয়াচর জোন (২৪ ই. বি. আর) এর জনৈক মেজরের নেতৃত্বে আনুমানিক ১০০ জনের এক সেনাদল ৩০ জন অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙ্গালীকে সঙ্গে নিয়ে নানিয়াচর থানাধীন ৭৯নং কেঙেলছড়ি মৌজার দার্য্যা পাড়ায় এসে অবস্থান নেয় ও ২৫ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করে নতুন ক্যাম্প স্থাপনের জন্য সুবিধামত জায়গা খোঁজার পর চলে যায়। একই তারিখে ২৭ ই. বি. আর. ঘাগড়া জোন হতে একদল সেনা কাউখালী থানাধীন ৯৮নং কচুখালী মৌজার পানছড়ি নামক স্থানে নতুন ক্যাম্প স্থাপনের জন্য জায়গা খোঁজে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য যে, যুদ্ধবিরতি চলাকালীন সময়ে সরকারী সেনারা এযাবৎ ১০/১২টি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করেছে।

জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারী উপ-কমিটির ৫ম বৈঠক

১২ই জুলাই '৯৫ইং বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপ-কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার ৫ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পানছড়ির ধুদুকছড়াতে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে ৩ সদস্যের সরকারী উপ-কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দেন কমিটির আহ্বায়ক জনাব রাশেদ খান মেনন। অন্যান্যরা হলেন শ্রী কল্পরঞ্জন চাকমা ও জনাব শাহজাহান চৌধুরী। অপরপক্ষে জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেন সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং অন্যান্যরা হলেন—শ্রী গৌতম কুমার চাকমা, শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান ও শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা।

সেদিন দুপুর ১২-৫০মিঃ বৈঠক শুরু হয় এবং অপরাহ্ন ৩-৪৫ মিঃ সমাপ্ত হয়। বৈঠকের শুরুতে সরকারী দলের প্রধানের অনুরোধক্রমে জনসংহতি সমিতির প্রধান বক্তব্য রাখেন এবং এ বৈঠক অনুষ্ঠানের আগে সরকার পক্ষ হতে সমিতি কাছে একটা খসড়া প্রস্তাব পাঠানোর যে প্রতিশ্রুতি ছিল সে বিষয়ে জানতে চান। এর জবাবে সরকার পক্ষের প্রধান জনাব রাশেদ খান মেনন বলেন যে, বিরোধী দলীয় সাংসদদের পদত্যাগের ফলে ইচ্ছা থাকা সত্বেও প্রতিশ্রুত খসড়া প্রস্তাব পাঠানো সম্ভব হয়নি। কারণ, রাজনৈতিক দলসমূহকে বাদ দিয়ে শাসনতান্ত্রিক কোন বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভবপর নহে। মেনন সাহেব আরো বলেন যে, সংলাপের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি বলবৎ থাকার কারণে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। সুতরাং আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য জনাব মেনন জনসংহতি সমিতির প্রধানের কাছে প্রস্তাব রাখেন। যেহেতু সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়নি, সুতরাং সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব নহে বলে সমিতির প্রধান তাঁর মত ব্যক্ত করেন।

এছাড়া আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে যুদ্ধবিরতি লংঘন, লতিবান (পানছড়ি) ইউনিয়ন বিভক্তিকরণ, জুম্ম শরণার্থীদের

প্রদানের মাধ্যমে উক্ত জমি বহিরাগত মুসলমান বাঙ্গালীর কাছে দখল ছেড়ে দিতে বাধ্য করে বলে জানা যায়।

নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের নামে একদিকে জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের সংলাপ এবং অন্য দিকে সংলাপের শর্তাধীনে যুদ্ধবিরতির সুযোগে বাংলাদেশ সেনারা নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপনের কাজ অব্যাহত রেখেছে।

গত ২রা মে '৯৫ইং গুইমারা ব্রিগেড (গোলন্দাজ) এর আওতাধীন মাটিরাঙ্গা জোন কর্তৃক মাটিরাঙ্গা থানার ২০৭নং ওয়াদ মৌজাস্থ থাংঠুং পাড়ার (ত্রিপুরা পাড়া) সন্নিকট স্থানে একটি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

এ মাসের ২য় সপ্তাহে দিঘীনালা থানাধীন ৫৬নং বড় হাজাছড়া মৌজাস্থ প্রদীপ কার্বারী পাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিমের এক স্থানে একটি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

এছাড়া ১২ই মে '৯৫ইং ৫৩ ই. বি. আর-এর মেজর মাহবুব এর নেতৃত্বে ১৮ জনের এক সেনাদল ২২জন অনুপ্রবেশকারী মুসলমান কুলী দ্বারা খাগড়াছড়ি সদর থানাধীন ২৬৩নং কমলছড়ি মৌজার মুখে এক টিলার জঙ্গল কেটে ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। ২৩শে মে '৯৫ ইং তারিখে নানিয়াচর জোন (২৪ ই. বি. আর) এর জনৈক মেজরের নেতৃত্বে আনুমানিক ১০০ জনের এক সেনাদল ৩০ জন অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙ্গালীকে সঙ্গে নিয়ে নানিয়াচর থানাধীন ৭৯নং কেঙেলছড়ি মৌজার দার্য্যা পাড়ায় এসে অবস্থান নেয় ও ২৫ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করে নতুন ক্যাম্প স্থাপনের জন্য সুবিধামত জায়গা খোঁজার পর চলে যায়। একই তারিখে ২৭ ই. বি. আর- ঘাগড়া জোন হতে একদল সেনা কাউখালী থানাধীন ৯৮নং কচুখালী মৌজার পানছড়ি নামক স্থানে নতুন ক্যাম্প স্থাপনের জন্য জায়গা খোঁজে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য যে, যুদ্ধবিরতি চলাকালীন সময়ে সরকারী সেনারা এযাবৎ ১০/১২টি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করেছে।

জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারী উপ-কমিটির ৫ম বৈঠক

১২ই জুলাই '৯৫ইং বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপ-কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার ৫ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পানছড়ির ধুদুকছড়াতে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে ৩ সদস্যের সরকারী উপ-কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দেন কমিটির আহ্বায়ক জনাব রাশেদ খান মেনন। অন্যান্যরা হলেন শ্রী কল্পরঞ্জন চাকমা ও জনাব শাহজাহান চৌধুরী। অপরপক্ষে জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেন সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং অন্যান্যরা হলেন—শ্রী গৌতম কুমার চাকমা, শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান ও শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা।

সেদিন দুপুর ১২-৫০মিঃ বৈঠক শুরু হয় এবং অপরাহ্ন ৩-৪৫ মিঃ সমাপ্ত হয়। বৈঠকের শুরুতে সরকারী দলের প্রধানের অনুরোধক্রমে জনসংহতি সমিতির প্রধান বক্তব্য রাখেন এবং এ বৈঠক অনুষ্ঠানের আগে সরকার পক্ষ হতে সমিতি কাছে একটা খসড়া প্রস্তাব পাঠানোর যে প্রতিশ্রুতি ছিল সে বিষয়ে জানতে চান। এর জবাবে সরকার পক্ষের প্রধান জনাব রাশেদ খান মেনন বলেন যে, বিরোধী দলীয় সাংসদদের পদত্যাগের ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুত খসড়া প্রস্তাব পাঠানো সম্ভব হয়নি। কারণ, রাজনৈতিক দলসমূহকে বাদ দিয়ে শাসনতান্ত্রিক কোন বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভবপর নহে। মেনন সাহেব আরো বলেন যে, সংলাপের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি বলবৎ থাকার কারণে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। সুতরাং আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য জনাব মেনন জনসংহতি সমিতির প্রধানের কাছে প্রস্তাব রাখেন। যেহেতু সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়নি, সুতরাং সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব নহে বলে সমিতির প্রধান তাঁর মত ব্যক্ত করেন।

এছাড়া আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে যুদ্ধবিরতি লংঘন, লতিবান (পানছড়ি) ইউনিয়ন বিভক্তিকরণ, জুম্ম শরণার্থীদের

প্রত্যাবাসন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের রিফিউজি হাই কমিশন ও আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটিকে জড়িত করার জন্য সমিতির নেতা সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

পরিশেষে উভয়পক্ষের আলোচনা-পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ঃ—

১) পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও এই অঞ্চলে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে উভয়-পক্ষ যুদ্ধবিরতির মেয়াদ ৩০শে সেপ্টেম্বর '৯৫ইং পর্য্যন্ত বর্ধিত করা,

২) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে বর্তমান পদ্ধতিতে যোগাযোগ রক্ষা করা ও প্রয়োজনে বৈঠক করা,

৩) আগামী দুই মাসের মধ্যে সমিতির ৫জন বন্দী সদস্যকে মুক্তি প্রদান করা।

বি ডি আর-এর নির্বিচার গুলিবর্ষণ ও গ্রেপ্তার

গত ১২ই জুন '৯৫ইং সোমবার মারিশ্যা জোনের অধীন শিজক দোজর ক্যাম্প ও ওল্ড লংকর হতে বি ডি আর এসে দোজর (বাঘাইছড়ি থানাধীন) বাজারস্থ শ্রীডিডিবো চাকমা (৩১) প্রকাশ কুকী কাপ্যা পীং কেগেরা চাকমার চায়ের দোকানে জড়ো হয়। বি ডি আর-এর সদস্যরা নানা অযৌক্তিক প্রশ্ন করে উক্ত চায়ের দোকানীকে উত্যক্ত করতে থাকে। এমতাবস্থায় বি ডি আর-এর একজন সদস্য পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে প্রবেশ করে ও কিছুক্ষণ পর দু'টি দেশীয় গাদা বন্দুক নিয়ে জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসে। বি ডি আরের সদস্যরা মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করার হীন উদ্দেশ্যে এ গাদা বন্দুকগুলি সাথে করে নিয়ে এসেছে বলে বিশেষ মহলের ধারণা। কিন্তু বি ডি আররা উক্ত চায়ের দোকানী ডিডিবো চাকমাকে উক্ত বন্দুকগুলো তার বলে বানোয়াট অভিযোগ এনে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিতে থাকে। এতে উক্ত ডিডিবো চাকমা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে দৌড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। ফলে বি ডি আর সদস্যরা বেপরোয়া ব্রাশ ফায়ার করে। কিন্তু ডিডিবো চাকমা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এতে বি ডি আররা আরো অতীষ্ট হয়ে দোকান তচনচ করে দেয়। পরে একই পাড়াবাসী শ্রী কালীচরণ চাকমা (৬০), পিতা—শ্রী নন্দ চাকমা ও তার ছেলে কেগেরা চাকমাকে বি ডি আর জোয়ানরা গ্রেপ্তার করে বেদম মারধর করার পর বাঘাইছড়ি থানায় হস্তান্তর করেছে বলে জানা যায়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সড়ক অবরোধ ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষ

১৮ই জুলাই '৯৫ইং বেআইনীভাবে আটককৃত পাহাড়ী ছাত্র নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি সদরে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অর্ধ দিবসের এক সড়ক অবরোধ কর্মসূচী গ্রহণ করে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচী পালনের সময় স্থানীয় পুলিশ বাহিনী উক্ত কর্মসূচী বানচালের লক্ষ্যে অবরোধ-কারী ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয় এবং পুলিশ বেশ কয়েকজন ছাত্রকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা যায়।

ভুল সংশোধন

প্রকাশিত জুম্ম সংবাদ বুলেটিন নং ১৯, ২০, ২১ সংখ্যার এম এন লারমার উদ্ধৃতি ''পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ··· ··· ··· ··· রিয়াং ··· ··· ··· ··· আমরা নিজেদেরকে পাহাড়ী বা জুম্ম বলি''
—এখানে রিয়াং শব্দের স্থলে খিয়াং পড়তে হবে।

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারণা ঃ তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।